Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:77
January-March, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-01.03
Published: 2024-06.06

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i77.225

Universal Principles of Human Rights and Islamic Human Rights Principles : An Analysis

Muhammad Rezaul Hossain*

Abstract

Islam has reinforced human rights since its inception by generating a sense of fraternity among people. For this reason, each and every Muslims must be careful about the human rights declared by Islam. Human rights have become a hotly debated issue in modern times. In the 19th century, the United Nations created the Human Rights Commission under its supervision and started working on the establishment of human rights. But later it is observed that even if the human rights principles adopted by the United Nations are not implemented, no rigorous measures are taken against the violations. Employing a comparative method, the article has reviewed the Islamic principles of human rights in juxtaposition of the universal principles of human rights declared by the United Nations and endeavored to determine the practical areas of human rights in an analytical manner. The article has substantiated that the concept of human rights in Islam is sustainable and pragmatic and more effective in practice.

Keywords: Islam, Human Rights, United Nations, Law, Western World.

মানবাধিকারের সর্বজনীন নীতি ও ইসলামের মানবাধিকার নীতি : একটি বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

ইসলাম শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করার মাধ্যমে মানবাধিকারকে সুসংহত করেছে। ফলে মুসলিম মাত্রই ইসলামের ঘোষিত মানবাধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। আধুনিক সময়ে মানবাধিকার বহুলচর্চিত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকে জাতিসংঘ তার তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার কমিশন তৈরি করে মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠায় কাজ শুরু করে। কিন্তু পরবর্তিতে দেখা যায়, জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকার নীতিমালা বাস্তবায়িত না হলেও তেমন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়না। প্রবন্ধটিতে তুলনামূলক পদ্ধতিতে মানবাধিকারের ইসলামী নীতিমালার পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে মানবাধিকারের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের মানবাধিকারের ধারণা টেকসই ও বাস্তব সম্মত এবং প্রায়োগিক দিক থেকে অধিক ফলপ্রসু।

মূলশব্দ: ইসলাম; মানবাধিকার; জাতিসংঘ; আইন; পশ্চিমা বিশ্ব

* Dr Muhammad Rezaul Hossain is an Associate Professor of Islamic Studies at Jagannath University, Dhaka. Email: rsenterprise7441@gmail.com

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ববাসী একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার। মানবাধিকারকে নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের কোনো জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনও এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনও চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি; যতটা আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা দিয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের অবস্থা খুবই হৃদয়বিদারক। এদিক থেকেও তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও মর্মান্তিক যে, এসব দেশের জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক যুগের শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের কাঁধ থেকে বিদেশী দখলদারদের সরিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কয়েকটি দেশের মানুষ স্বাধীন রাষ্টের সুবিধা পেলেও অধিকাংশ দেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল আজও ভোগ করতে পারেনি। কারণ স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার পূর্বেই অনেক দেশে একনায়কত্বের বোঝা চেপে বসে জনগণের নাগরিক ও মৌলিক অধিকারগুলো হরণ করতে লাগল। অনেক দেশেই মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগকে চিরতরের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো। কিছু কিছু দেশে সেই সুযোগ থাকলেও তা খুবই সীমিত পরিসরে। স্বাধীনচেতা মানুষেরা শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূলে পরিণত হতে লাগলেন। মানবাধিকার কর্মীরাও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হতে লাগলেন। কারণ মানবাধিকার সুরক্ষার নীতিমালা প্রণয়ণকারী দেশগুলো নিজেরাই মানবাধিকার অহরহ ক্ষুণ্ন করে চলছে। মানবাধিকারের নীতিমালা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে বারবার পরিবর্তন করেছে। ক্ষেত্র বিশেষ এই নীতিমালার দোহাই দিয়ে পরাশক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপও করেছে। বরং তারা অনেক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও হরণ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের বাস্তবায়ন বনাম ইসলামী মানবাধিকার নীতির বাস্তবায়নের একটি চিত্রায়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আধুনিককালের মানবাধিকারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস র্যালোচনা পূর্বক ইসলামী মানবাধিকার বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কিভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে তা নিরুপণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মানবাধিকারের পরিচয়

মানবাধিকার বা Human Rights কথাটি দুটি শব্দ তথা Human ও Rights নিয়ে গঠিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র উৎপত্তির পূর্বে মানুষের 'অধিকার' এর জন্ম হয়েছে, না পরে হয়েছে- এ নিয়ে পণ্ডিত মহলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন, মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের পর থেকেই তার অধিকারের বিষয়টি চলে এসেছে। যেমন John locke-এর মতে, মানুষ স্বভাবতঃই কিছু অধিকার নিয়ে জন্ম লাভ করে, যাকে প্রাকৃতিক অধিকারও বলা হয় এবং যা প্রাক রাষ্ট্রীয় যুগেও বর্তমান ছিল। পক্ষান্তরে Gettel-এর মতে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে মানুষের অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্র অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা না দিলে সে অধিকার অর্থহীন। অতএব রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় আইনই অধিকার সৃষ্টি করে এবং তা ভোগ করার নিশ্চয়তা দেয়। আমরা বলতে পারি যে, সেই বিষয়বস্তু যা মানুষের জন্ম থেকে শুরু হয়, যাকে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার বলে থাকি, যা আধুনিক রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার পূর্ব থেকে ছিল। অতঃপর সেই অধিকারগুলো মানুষ আধুনিক রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থায় এনে আরও সুন্দর, সাবলীল, গ্রহণযোগ্য করে আইনী কাঠামোতে রূপান্তরিত করেছে (Imam Batayan, 2019)। মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানব সন্তানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অধিকারসমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। আরো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটেও 'মানবাধিকার' পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকেই বোঝায়। মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের আচার-ব্যবহার, নীতি, আচরণ, ব্যবস্থা-রীতি, আইন-বিধি, কার্যক্রম ও কার্যব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রয়োজন ও চাহিদা, প্রয়োগ ও প্রযুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জড়জীবন, কার্যজীবন, চিন্তাজীবন, জড়জগৎ, চিন্তাজগৎ, প্রাণীজগৎ, তথা বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছু মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত (Joarder 1988, 1)। মানবাধিকার এর পরিধি কতটুকু বিস্তৃত তা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে,

- মানবাধিকার এমন কিছু অধিকারকে বোঝায়, যা 'শুধু মানুষের'; পশু-পাখি বা গাছপালার নয়।
- মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার, কোন শ্রেণী বা দলের নয়।
- মানবাধিকার সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য, কারো কম বা কারো বেশি নয়।
- মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়।
- মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার, যা আদায়যোগ্য।
- মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের, সর্বস্থানের, সর্বকালের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি নির্দিষ্ট কোন স্থান বা কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এটি হচ্ছে এমন এক অধিকার, যাতে মানুষ হিসেবে পৃথিবীর যে কোনো শ্রেণিপেশার মানুষের সমান সুযোগ রয়েছে।

এক কথায় মানবাধিকারের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে সকল অধিকার মানুষ হিসেবে সকলের জন্য প্রযোজ্য তা হল মানবাধিকার।

ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকারের ধারণাটি আল্লাহ প্রদত্ত। ইসলামী পরিভাষা হিসেবে 'হাক্কুল ইবাদ' (حق العباد) তথা বান্দার অধিকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানবাধিকার হলো সে সকল অধিকার, যেগুলো মানুষের মর্যাদা এবং সম্মানের জন্যই মানুষদেরকে দেওয়া হয়। যেমন আল কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত (al-Qur'ān, 49:13)।

উপরিউক্ত আয়াতে মানুষের মান, সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনার পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্পর্ক কেমন হবে সেই দিকটিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকারের উৎপত্তি হয়েছিল প্রথম মানব হযরত আদম আ. এর সময়কাল থেকেই। আল্লাহ তাআলা আদম আ. এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ...﴾

আর তিনি আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন ...(al-Qur'ān, 2:31)।

এখানে كُلَّهَا শব্দ থেকে বোঝা যায়, এই জ্ঞান ছিল পূর্ণাঙ্গ। মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ণ চেতনা ও অপরিহার্যরূপে উক্ত জ্ঞানের মধ্যে শামিল ছিল। আদম আ. এর জীবনেই যখন মানবাধিকারের প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হল, তখন সাথে সাথেই এই সত্যও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষ কেবল নিজের ধারণা অনুমান অথবা সংজ্ঞার ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহ নির্ধারিত বিধানের কারণে এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনাসম্পন্ন ছিল। প্রমাণস্বরূপ আদম আ. এর দুই পুত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক পুত্র যখন আল্লাহর দরবারে নিজের কোরবানী কবুল না হওয়ার পর তার অপর ভাইকে হত্যার হুমকি দিল, তখন তিনি বলেছিলেন,

﴿لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার দিকে হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াব না, আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। (al-Qur'ān, 5:28)

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, মানব জীবনের সম্মান ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে আদম আ. এর পুত্রের জ্ঞান ছিল। এ কারণে সে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ভাইকে হত্যা করা ঠিক মনে করেনি।

আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বান্দার অধিকার সম্বলিত যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের

চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন কানুনসহ মানবাধিকারে রূপ পেতে থাকে। মানুষের পরিসর যত বিস্তৃত হয়েছে, তাকে সুশৃঙ্খল করার বিধানও তত নাযিল হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শরীয়তের বিধানের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ হিজরতের পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে এক বৈঠকে বসেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে ৬২৪ খ্রি. সালে এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন। এ সন্ধিপত্র ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে আখ্যায়িত। 'মদীনা সনদ' পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। আরবী ভাষায় লিখিত মদীনা সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। এই সনদের অধিকাংশ ধারাই মানবাধিকারকে সমুন্নত করেছে এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভূমিকা রেখেছে।

আধুনিক সময়ে মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ

সর্বজনীন মানবাধিকার ও ইসলামে মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনার আগে মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন। এতে আধুনিক কালের মানবাধিকার ও ইসলামী মানবাধিকারের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। মানবাধিকারের ধারণা কখন থেকে শুরু হয় তা নিয়ে কয়েক ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

ক.সাইরাস স্তম্ভ

মানবাধিকারের ধারণা শুরু হয়েছিল খ্রিস্ট্রপূর্ব ৫৩৯ সালে। এ সময়ে ইরাকের ব্যাবিলন শহর জয় করার পর সম্রাট সাইরাস সকল বন্দি ও দাসীদের মুক্ত করে দেন। এমনকি তিনি ঘোষণা দেন যে, মানুষ তাঁর নিজ ধর্ম কী হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে। সাইরাসের উদ্ধৃতি সম্বলিত 'সাইরাস স্তম্ভ ' নামক কাদা মাটির স্তম্ভ হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম মানবাধিকারের ঘোষণা পত্র। (Sayed 2016, 33)।

খ. ম্যাগনাকার্টা চুক্তি

ম্যাগনাকার্টাকে আধুনিক সময়ে মানবাধিকারের প্রথম সাংবিধানিক দলীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দশম শতকের পর ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডের জনগণের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নানাভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মানবাধিকার তখন ছিল ভূলুণ্ঠিত। রাজা জনের নানাবিধ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য স্টিফেন ল্যাংটনের নেতৃত্বে তার সহযোগীরা তাদের অধিকারসমূহ একটি দলীলে লিপিবদ্ধ করেন এবং ১২১৫ সালে রাজাকে এ দলীলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এ দলীলই ইতিহাসে ম্যাগনা কার্টা বা মুক্তির মহাসনদ নামে বিখ্যাত।

গ. পিটিশন অব রাইটস প্রদান

ম্যাগনাকার্টায় কতিপয় মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হলেও তাতে সব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি। কেননা, যারা রাজা জনকে এ দলীলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের অধিকার রক্ষা করা এবং আরো

সুবিধা লাভ করা। এছাড়া এ সনদে ব্যারনদের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং রাজা সেগুলো উপেক্ষা করে চলেছিলেন। তাই ম্যাগনাকার্টায় যে অধিকার খর্ব করা হয়েছিল তা আদায়ের জন্য রাজা ও ব্যারনদের মধ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটের জন্ম হয়। এতে রাজার স্বৈরাচারী কাজ যেমন, পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া করারোপ, বেসরকারী বাড়িতে সৈন্যদের ভাড়ায় রাখা, সামরিক আইন প্রবর্তন এবং অন্যায়ভাবে জনগণকে বন্দী করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। প্রথম চার্লস অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিটিশন অব রাইট বা প্রজার অধিকারের আবেদনপত্র মেনে নেন। এ আবেদনপত্র ইতিহাসে দ্বিতীয় ম্যাগনাকার্টা বা মুক্তির দ্বিতীয় মহাসনদ নামে পরিচিত। ১৬২৮ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক 'পিটিশন অব রাইটস' প্রদান করা হয়, যা ছিল মানবাধিকারের সর্বপ্রথম সাংবিধানিক দলীল। এ দলীলে মাত্র ৪টি ধারা ছিল। যদিও এ দলীলটির বাস্তবে প্রয়োগ ঘটে নাই। প্রথম চার্লস 'পিটিশন অব রাইটস' মেনে নিলেও তিনি সে মোতাবেক কাজ করেননি। তিনি পূর্বের মতই তার স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতে থাকেন (Sayed 2016, 33)।

ঘ. বিল অফ রাইটস

পিটিশন অব রাইটের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যায়নি। এ কারণে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলতেই থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৬৭৯ সালে হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট প্রণীত হয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এ আইনটি মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত। এ আইনে স্থির হয় যে, কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অনিশ্চিতকালের জন্য বন্দী করে রাখা যাবে না। কাউকে বন্দী করা হলে তাকে অনতিবিলম্বে বিচারাধীন করতে হবে এবং সন্তোষজনক কারণ না পেলে বিচারকগণ ঐ ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে পারবেন। 'হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট' প্রণীত হলেও তার বাস্তবায়ন পুরোপুরিভাবে না হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ফলে, ১৬৮৯ সালে বিল অব রাইটস বা অধিকার আইন নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয় (Ibid)। এ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় রাজশক্তির সাথে জনশক্তির শতাব্দীকালের বিরোধের অবসান হয় এবং এরপর রাজশক্তি জনশক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিল অব রাইটসও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর একটি স্তম্ভ। কিন্তু এ অধিকার আইনও সকলের জন্য মৌল মানবাধিকারের দাবীর প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। 'বিল অব রাইটস' গৃহীত হওয়ার অল্পকাল পরেই 'টলারেশন অ্যাক্ট' বা ধর্ম সহিষ্ণুতা আইন নামে আর একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইনে রোমান ক্যাথলিক ব্যতীত প্রোটেস্ট্যান্টদের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে ইংল্যান্ডে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এগিয়ে যেতে থাকে। 'পিটিশন অব রাইটস', 'বিল অব রাইটস' এবং 'ম্যাগনাকার্টা' এই তিনটি ঐতিহাসিক দলীলকে একত্রে বলা হয়, 'ইংলিশ সংবিধানের বাইবেল'(Salauddin 2004, 27-28)।

চ. ডিক্লারেশন অফ ইনডিপেন্ডেন্স

ইংল্যান্ডের পর মানবাধিকার নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মহানায়ক জর্জ ওয়াশিংটন পেনসেলভেনিয়ার ফিলাফিলডেল হতে Declaration of Independence এর ঘোষণা দেন। যেখানে বলা হয়:

> All men are created equal with inalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness[১]

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ ঘোষণায় জনগণের এমন ক্ষমতা ও অধিকারের কথা বলা হয় যে, সরকার কোন সময় অন্যায় কাজ করলে কিংবা সরকার জনগণের অধিকার খর্ব করলে জনগণ যেকোন সময় সরকারকে উৎখাত করতে পারবে (Sayed 2016, 34)। ১৭৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতির প্রাথমিক আইন নির্ধারণ এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংজ্ঞায়িত করে।

ছ. ডিক্লারেশন অফ দি রাইটস্ অফ ম্যান এন্ড সিটিজেন

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকারকে অনুসরণ করে ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবে তৎকালীন রাজা ষোড়শ লুই ও তার স্ত্রী রাণী মেরিসহ অনেক রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের গিলেটিনে হত্যা করা হয়। এরপর বিপ্লবীদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হতে থাকে এবং তারা একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের ব্যাপারে তারা 'Declaration of the rights of man and Citizens' নামে একটি দলীল প্রণয়ন করে। এখানে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকারের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। এখানকার ধারণাসমূহ পরবর্তীতে মানবাধিকার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Sayed 2016, 33)।

জ. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা

সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারণাটি অতি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারণাটি এসেছে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী প্রায় দশ মিলিয়ন সাধারণ মানুষ হত্যা করে। অদূর ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত না হতে পারে তার জন্য পশ্চিমা জাতিগুলো নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয়ী হলে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো মিলে জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের ৬৮ নং ধারা অনুযায়ী এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ একটি মানবাধিকার সনদ প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। জাতিসমূহের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে তারা মানবাধিকার সনদ প্রণয়নের কাজ শুরু

১. অর্থ: সমস্ত মানুষকে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ অন্বেষণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সাথে সমানভাবে তৈরি করা হয়েছে।

করে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিদগণের পরামর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত করে এ সনদ প্রণীত হয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণাপত্রের ৩০ টি ধারা আছে। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন এই ঘোষণাপত্রটি মানবাধিকারের প্রথম সাংবিধানিক দলীল ও সনদ হিসেবে অদ্যাবধি সমগ্র পৃথিবীতে গৃহীত হয়ে আসছে (Sayed 2016, 34)।

মানবাধিকারের ধারাসমূহ এবং ইসলামের মানবাধিকার ধারণা

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ভাষ্য উল্লেখ করা হলো এবং উক্ত ধারার সাথে ইসলামের মানবাধিকার নীতিমালার তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

- **ধারা-১ :** সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ (NHRC 2023)
- **ধারা- ২ :** এ ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে। কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীন হোক, হোক অধিভুক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান (Ibid)।

উপরিক্ত ধারা দুটিতে মূলত যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো: মানুষ হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান। এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমান। মানুষকে সৃষ্টির শুরুর কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً...﴾

হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা একান্তভাবে ভয় কর তোমাদের সেই রবকে, যিনি তোমাদের একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন... (al-Qur'ān, 4: 1)

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে

তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তবে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন (al-Qur'ān, 49:13)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তাহল, সমস্ত মানুষের জন্ম-উৎস এক। ভিন্ন ভিন্ন বংশধারা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদাকে বিভক্ত করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হতে পারেনা। দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ তাআলা মানব সমাজকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন শুধু তাদের পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। অন্য কথায় একটি গোষ্ঠী, একটি জাতি ও একটি গোত্রের অন্যদের উপর মর্যাদা ও গৌরবের এমন কিছু নেই যে, তা নিজেদের অধিকার বাড়িয়ে দেবে এবং অন্যদের কমিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা যে সব পার্থক্য করেছেন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও ভাষার বৈচিত্র্য- এসব গর্ব প্রকাশ করার জন্যে নয়। বরং এ জন্যে করেছেন যাতে করে পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পার্থক্য করা যায়। যদি সব মানুষ একই রকম হতো তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ বিভক্তি স্বাভাবিক। তবে এটা অন্যের অধিকার হনন কিংবা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে নয়। মর্যাদা ও গৌরবের ভিত্তি হলো উন্নত নৈতিক চরিত্র। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার মর্যাদাবান কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর তাদের দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করতো। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি: মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম (Muslim 2015, 1688)।

- **ধারা- ৩:** জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে। (NHRC 2023)।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন পবিত্র, তার উপর আক্রমণ চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল কুরআনে পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি ছিলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড। সেখানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হত্যা করেছিল। প্রথম বারের মতো তখনই প্রয়োজন দেখা দেয় মানুষকে মানুষের প্রাণের মর্যাদা শেখানোর এবং একথা বলে দেয়ার যে, প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এ ঘটনা উল্লেখ করার পর আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا﴾

এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন তামাম

মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচালো, সে যেন তামাম মানুষকে বাঁচালো। (al-Qur'ān, 5 : 32)

কুরআন মাজীদ এ আয়াতে একজন মানুষের অন্যায় হত্যাকে গোটা মানবজাতির হত্যা বলে উল্লেখ করেছে। আবার একজন মানুষের জীবন রক্ষাকে গোটা মানবজাতির জীবন রক্ষার সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছে। অন্য কথায় কোনো মানুষ যদি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে গোটা মানবজাতিকে জীবিত রাখার কাজ করে। এ ধরনের প্রচেষ্টা এতো বড় কল্যাণের কাজ যে, এটাকে গোটা মানবতাকে জীবিত করার সমান গণ্য করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল দু'টি অবস্থায় এ নীতির ব্যতিক্রম করা যাবে। তা হলো: এক কোনো ব্যক্তি হত্যার অপরাধে অপরাধী হলে কিসাস নেয়ার জন্য (বিচারের মাধ্যমে) তাকে হত্যা করা যাবে। (দুই) কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে তাকেও (হত্যা করা যাবে (বিচারের মাধ্যমে)। এ দু'টি ব্যতিক্রমী অবস্থা ছাড়া আর কোনো অবস্থায়ই মানুষ হত্যা করা যাবে না। মানব ইতিহাসের প্রাথমিক যুগেই মহান আল্লাহ মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধানের এ নীতি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

- **ধারা- ৪:** কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে (NHRC 2023)।

দাস সাধারণত দুইভাবে হয়। যথাঃ

এক. জন্মগতভাবে দাসত্ব বরণ করা। যাদের পূর্বপুরুষ দাস ছিল, বংশপরম্পরায় তারাই দাসত্ব বরণ করত।

দুই. যুদ্ধবন্দী অথবা অন্য কোন কারণে বন্দী হয়ে দাসত্ব বরণ করা।

ইসলাম যুদ্ধবন্দীদেরকে শর্ত সাপেক্ষে দাস-দাসী বানানোর অনুমতি প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا﴾

তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর হয় অনুগ্রহ করবে কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না তারা যুদ্ধের অস্ত্র সংরবণ করবে (al-Qur'ān, 47:3)।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যুদ্ধবন্দীদের হয় বিনিময় মূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে নতুবা না নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এখানে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট যে যুদ্ধবন্দী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাসক তথা রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান বন্দীদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করবেন এবং তাদের কাছ থেকে শরীআত অনুযায়ী তা গ্রহণ করবেন অথবা তাদেরকে হত্যা করবেন কিংবা গোলাম বানিয়ে নেবেন। অথবা বিনিময় মূল্য নিয়ে বা না নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিবেন।

- **ধারা-৫:** কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না (NHRC 2023)।

ইসলামী মানবাধিকার আইনে দৈহিক নির্যাতন ও যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে। কোনো অপরাধীকেও দৈহিক নির্যাতন ইসলামে নিষিদ্ধ। তাছাড়া ইসলামের দেয়া মৌলিক অধিকারের অন্যতম হলো, যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لا يُحِبُّ اللّهُ الجَهرَ بِالسُّوءِ مَنِ الْقَوْلِ اِلا مَن ظُلِمَ﴾

মন্দ কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। (al-Qur'ān, 4:148)

অর্থাৎ, ইসলাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মযলুমকে জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে বিচারের মুখোমুখি করার অধিকার দিয়েছে।

ইসলামের নির্দেশ হলো, কোনো যালিমের আনুগত্য লাভের অধিকার নেই। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম আ. কে নেতা মনোনীত করে বললেন,

﴿وَ اِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ﴾

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না (al-Qur'ān, 2:124)।

অত্র আয়াতে ইবরাহীম আ. এর প্রশ্নোত্তরে আল্লাহ তাআলা যে জবাব দিয়েছেন তাতেই স্পষ্ট যে, যালিমদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে এমন কোনো ছাড় নেই যার ভিত্তিতে তারা অন্যের আনুগত্য লাভের দাবি করতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে ,

﴿ وَ لَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

এবং সীমালংঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না (al-Qur'ān, 26:151)

আরো উল্লেখ হয়েছে,

﴿وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا﴾

'আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে' (al-Qur'ān,18 : 28)

- **ধারা- ৬ :** আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে (NHRC 2023)
- **ধারা- ৭:** আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা

বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমান ভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে (NHRC 2023)।

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে একেকজন সত্ত্বা বা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এর প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ইসলামী আইন অনুযায়ী, মানুষ শুধু নিজের কাজকর্ম এবং নিজের কৃত অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। অন্য কারো অপরাধ বা কৃতকর্মের জন্য তাকে পাকড়াও করা যাবেনা- এটাই আল কুরআন প্রদত্ত মূলনীতি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى﴾

প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই উপর বর্তায়। আর কোন ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না (al-Qur'ān, 6:164)।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৭ নং ধারাতে মানুষের আইনগত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ইসলাম সে ব্যবস্থাটি বহু পূর্বেই ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে বাস্তবায়ন করে গেছে। ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। কেউ বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন- আল্লাহই উভয়ের নিকটতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (al-Qur'ān, 4:135)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষাদানে তোমরা অবিচল থাকবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (al-Qur'ān, 5:8)

ইসলাম ন্যায়বিচার সম্পর্কে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তা উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

- **ধারা-৮:** শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে (NHRC 2023)।
- **ধারা-৯:** কাউকেই খেয়াল-খুশীমত গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেয়া যাবে না (Ibid)।
- **ধারা-১০:** নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে (Ibid)।

ইসলামী আইনে প্রত্যেক বিচার প্রার্থীর বিচার লাভের অধিকার আছে। ইসলাম এই অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করো- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (al-Qur'ān, 4:59)।

ইনসাফভিত্তিক বিচারকার্য পরিচালনার জন্য পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে,

﴿وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴾

আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে (al-Qur'ān, 4:58)।

খেয়াল-খুশীমত গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে উমর রা. বলেন,

لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ

নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত কোন মুসলিমকে কয়েদ করা যাবে না। (Ibn Anas 2003, 1528)

কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করার জন্য তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা, প্রকাশ্য আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুরোপুরি সুযোগ দেয়া আবশ্যক। ১১ নং ধারায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হয়েছে।

- **ধারা-১১:** দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকার সম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে। কাউকেই এমন কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ত্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলনা। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না (NHRC 2023)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী আইনে শাসক ও সাধারণ মানুষ সকলেই সমানভাবে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার ভোগ করবে। প্রত্যেকেরই অভিযোগ নিয়ে বিচারকের কাছে সুবিচার লাভের অধিকার আছে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারিত হবে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সকল অভিযুক্তই নিরপরাধ। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে পাকড়াও করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾

ধারণা প্রসূত বেশিরভাগ বিষয় থেকে বিরত থেকো (al-Qur'ān,49 : 12)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে (al-Qur'ān, 49 : 6)।

রাষ্ট্র অবশ্যই একটি স্বচ্ছ ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবে যেখানে প্রত্যেকের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে। কোনো অপরাধীকেই ততোক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবেনা যতোক্ষণ না একটি পূর্ণাঙ্গ আদালতে তার অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর আর কসমের দায়িত্ব বিবাদীর (al-Tirmidhī 2015, 1341)

হাদীসটিতে যে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে তা হলো: কোনো ব্যক্তি অভিযুক্ত হলেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না বরং অভিযোগ উপস্থাপনকারীকে যথাযথ প্রমাণ হাজির করতে হবে। অন্যথায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার মৌখিক শপথের মাধ্যমেই দায়মুক্তি দিতে হবে।

- **ধারা- ১২:** কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে (NHRC 2023)।

ইসলামের দেয়া মৌলিক অধিকার অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত জীবনকে নিরাপদ রাখার অধিকার রাখে। যেমন অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে আল কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (al-Qur'ān, 24: 27)।

এমনকি ঘরের লোকদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধীনস্তগণ এবং তোমাদের যারা বয়:প্রাপ্ত হয়নি তারা যেন (তোমাদের কাছে আসতে) অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়ে:- ফজর নামাযের পূর্বে, আর যখন দুপুরে রোদের প্রচণ্ডতায় তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ আর 'ইশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে (প্রবেশ করলে) তোমাদের উপর আর তাদের উপর কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অন্যের কাছে ঘুরাফিরা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (al-Qur'ān, 24: 58)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ...﴾

তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। (al-Qur'ān, 49:12)।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয় এবং অন্যের ঘরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে।

- **ধারা-১৩:** নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই নিজ দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে (NHRC 2023)।
- **ধারা-১৪:** নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। (Ibid)
- **ধারা-১৫:** প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না (Ibid)।

ইসলামী আইনে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার আছে। যথাযথ কারণ দর্শানো ব্যতিত কোন মানুষের চলাচলকে সীমিত করা যাবেনা কিংবা কাউকে অন্তরীণ করে রাখা যাবেনা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۭ وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ﴾

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান (al-Qur'ān,67:15)।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ﴾

বল তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তারপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে (al-Qur'ān, 6 : 11)।

ইসলামী আইনে প্রত্যেক নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের এই অধিকার আছে যে, রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেখানে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে সেখানেই সে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا﴾

নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি যুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল (al-Qur'ān, 4: 97)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ﴾

আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে... (al-Qur'ān, 9: 6)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নিজের পছন্দমত বাসস্থান খুঁজে নিতে পারবেন। ইসলাম তার এই অধিকার নিশ্চিত করেছে।

- **ধারা-১৬:** ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে। বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে। পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

পরিবারকে মানবজীবনে সামাজিক চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়। একটি সর্বজনীন, স্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবার। পরিবার মানবসমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলেও গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এর অবস্থান অত্যধিক। পরিবারকে ঘিরেই মানুষের সামাজিক জীবন আবর্তিত হয়ে থাকে এবং এটি মানব প্রজন্ম তথা সন্তানের জন্ম, লালন ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। হৃদ্যতাপূর্ণ মানবপরিবার আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। পরিবার গঠন মানুষের সৃষ্টিগত অধিকার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ...﴾

আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন; যেন তোমরা তার কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন ... (al-Qur'ān, 30:21)

ইসলামে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেরই নিজ পছন্দ অনুসারে বিয়ের অধিকার আছে এবং বিয়ের পরে স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকেরই পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহর বাণী,

﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

'আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা' (al-Qur'ān, 2:228)।

সেই সাথে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহর বাণী,

﴿وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤی اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـًٔا وَّ یَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْرًا كَثِیْرًا﴾

'আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ' (al-Qur'ān, 4:19)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَیِّقُوْا عَلَیْهِنَّ﴾

'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও' (al-Qur'ān, 65:6)।

ইসলাম একই সাথে সন্তানের ও পিতামাতার অধিকার নিশ্চিত করেছে। একজন শিশু জন্ম নেয়ার পর তার লালন-পালনের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রতিটি মা ও বাবার দায়িত্ব। এজন্য ইসলাম সন্তান জন্ম নেয়ার পর পরই মা বাবার প্রতি বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেয়। যেমন সুন্দর নাম রাখা, আকিকা করা, ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এক কথায় সন্তানের প্রতিটি মুহূর্তে মা,বাবাকে যত্ন নেয়ার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে আবার এই মা-বাবাই যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন আবার সন্তানকে মা-বাবার যত্ন নেয়ার নির্দেশনাও ইসলাম দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ قَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا .وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا﴾

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন (al-Qur'ān, 17:23-24)

ইসলামী নিয়মানুযায়ী সাধারণভাবে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের সকল ক্ষমতা পুরুষের। তবে ক্ষেত্রবিশেষ যেমন: স্ত্রী নির্যাতিতা হলে অথবা বিবাহের পর স্বামী যদি চিররুগ্ন, পুরুষত্বহীন হয়ে যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে, আর স্বামী

যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয়; তাহলে স্ত্রী কর্তৃক অর্পিত তালাকের পদ্ধতি গ্রহণ করে পৃথক হতে পারবে। তাছাড়া এমতাবস্থায় কুরআন কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রীকে খুল'আ এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

তালাক দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কারও কোন পাপ নেই। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সুতরাং তা লঙ্ঘন কর না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তারাই জালিম (al-Qur'ān, 2:229)

- **ধারা-১৭:** প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে। কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (NHRC 2023)।

প্রতিটি মানুষেরই সৎপথে থেকে বৈধভাবে আয় করার অধিকার আছে। ইসলামী আইনেও এর ব্যতিক্রম নেই। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾

পুরুষের অংশ রয়েছে সেই সম্পদে, যা তাদের মাতাপিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রেখে গিয়েছে। আর নারীদের জন্য অংশ রয়েছে সেই সম্পদে, যা তাদের মাতা-পিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ রেখে গিয়েছে। সেই সম্পদ কম হোক বা বেশী হোক, তাতে তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। (al-Qur'ān, 4:32)

তবে পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা, প্রতারণার আশ্রয় নেয়া কিংবা ছলচাতুরী করা, সুদ, ঘুষসহ অন্যান্য অনৈতিক পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। এজন্য ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত নিয়ম হলো, জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতিত বৈধভাবে উপার্জিত কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা কেড়ে নেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হবেনা যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মালিকানা হস্তান্তর করেন কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রচলিত আইনে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلا تَا كُلُوا اَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ ভোগ দখল করো না (al-Qur'ān, 2:188)

- **ধারা-১৮:** প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে (NHRC 2023)।
- **ধারা-১৯:** প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত (Ibid)।

ইসলাম খুবই সহজাত ও স্বভাব নিয়মের ধর্ম। সুতরাং কারও স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে জোড়-জবরদস্তি করে কিংবা বল প্রয়োগ করে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলা বলেন,

﴿لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾

'তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন'(al-Qur'ān, 109:6)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ﴾

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই (al-Qur'ān, 2:256)।

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংগত ও অশোভন মন্তব্য করার ব্যাপারে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং তার ধর্মীয় নেতাদের মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত (al-Qur'ān, 6:108)।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যদি সরকারের কাছে বিচার প্রার্থনা করে তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের বিচারকার্য পরিচালিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

'তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করতে

পারবে না, আর যদি তুমি ফয়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর ন্যায়ভিত্তিক। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন' (al-Qur'ān, 5: 42)।

প্রত্যেকের নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও ধর্মাদর্শের চর্চা, শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং উপাসনা ও আর্চনার মাধ্যম কিংবা উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে তা প্রচারের অধিকার থাকবে। ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সকল প্রকারের কর্মকাণ্ড একাকী কিংবা দলীয়ভাবে সম্পাদন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। এজন্য প্রতিটি মানুষকেই ইসলাম একাকী কিংবা দলীয়ভাবে নিজ নিজ আদর্শ প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

বলুন, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (al-Qur'ān,12:108)।

আর মুসলিম ব্যতীত অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বী তার ধর্মমত পরিবর্তন করে অন্য যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে চাইলে এমনকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে ইসলামী আইন বা রাষ্ট্র কোনোরূপ বাধা দেয় না। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে দীন পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করো (al-Bukhārī 2005, 3017)

- **ধারা-২০ :** প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে এবং কাউকে কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না (NHRC 2023)।

ইসলাম কল্যাণকর কাজে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হলো, ভালো ও ন্যায়ের কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় ও যুলুমের কাজে কারো সাথে সহযোগিতা না করা। নিজের ভাইও যদি মন্দ কাজ করে সেক্ষেত্রেও তার সাথে সহযোগিতা করা যাবে না। আর কল্যাণের কাজ যদি শত্রুও করে তাহলে তাকেও সহযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিত কর, তবে পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না (al-Qur'ān, 5:2)

- **ধারা-২১:** প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে

অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (NHRC 2023)।

ইসলাম মানুষের জাতীয় ও রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের পথকে সুগম করেছে। মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে তাই মানুষের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকরাও সরকার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার লাভ করেন। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: মজলিশে শুরা ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার নির্বাচন বা পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক পরবর্তী সরকারের নাম ঘোষণার মাধ্যমে সরকার নির্বাচন বা পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি অন্তর্বর্তী দায়িত্বশীল পরিষদের মাধ্যমে পরবর্তী সরকার নির্বাচন বা সর্বসাধারণের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করতঃ তাদের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচন করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾

তাদের সামগ্রিক তৎপরতা পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে। (al-Qur'ān, 42:38)

তবে 'জনগণের ইচ্ছাই সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি'- এটি ইসলামী আকীদার সাথে সংঘাতপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলামী বিশ্বাসানুসরে ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহ তাআলা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

আপনি বলুনঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (al-Qur'ān, 3:26)

- **ধারা-২২:** সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে (NHRC 2023)।

সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা মদিনা সনদ ও বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্পষ্টভাবে দিয়ে গেছেন। সেই ভাষণে সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার পর তিনি ইরশাদ করেছেন:

إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا

তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান পরস্পরের জন্য আজকের এ দিনে এ নগরের ন্যায়ই নিষিদ্ধ। (al-Bukhārī 2005, 4406)

প্রত্যেক ব্যক্তি তার উৎপাদিত পণ্য,সাহিত্যকর্ম কিংবা নিজ প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত যে কোনো উৎপাদন থেকে লাভবান হতে পারবেন। এজন্য কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সহায়তা নেবার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আর সেটি হলো: উৎপাদিত জিনিসটি কোনোভাবেই রাষ্ট্র কিংবা ইসলামী শরীয়ার জন্য হুমকি হতে পারবেনা। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতার জন্য ইসলাম মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহর বাণী:

﴿وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

'আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল কওমের জন্য নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে' (al-Qur'ān, 45:13)।

অত্র আয়াতের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র যমীনের সবকিছু তিনি মানুষের অধীন করে দেয়ার কারণই হলো যাতে মানুষ তাদের মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারে। তাইতো মানুষ আজ সমুদ্রের তলদেশে গিয়েও মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করছে। ভাগ্য পরিবর্তন করতে গিয়ে কেউ অন্যায় কাজে জড়িয়ে না পরে সেজন্যও সতর্ক করা হয়েছে।

﴿لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾

আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না (al-Qur'ān, 26:183)।

- **ধারা-২৩:** প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরী বেছে নেয়ার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে। কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

  কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে। নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ই উনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে (NHRC 2023)।

ইসলাম শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার নিশ্চিত করেছে। শ্রমিক মালিকের ন্যায়ই একজন মানুষ। অতএব তার জীবনমান যাতে মানবেতর পর্যায়ে গিয়ে না পৌঁছে, সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার মজুরি নির্ধারণ করা উচিত; এটি ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণির লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, তার বিরুদ্ধে জয়ী হবো। কিয়ামতের দিন আমি যাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করবো তারা হলো: ১. যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। ২. যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে। ৩. যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পূর্ণ মজুরি দেয় না।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে প্রতিটি মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার প্রদান করেছে। স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার যে ইসলাম প্রদান করেছে তার প্রমাণ রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীতে:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।(al-Qur'ān, 62:10)

শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে মালিক যদি গড়িমসি করে তাহলে ইসলামী বিধান মতে তা আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করার অধিকার অবশ্যই শ্রমিকদের থাকবে। কেননা কেউ নির্যাতিত হবে আর তার প্রতিবাদ করার অধিকার তার থাকবে না- এরূপ জুলুমাত্মক নীতি অবশ্যই ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো:

﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। (al-Qur'ān, 2:279)

- **ধারা-২৪:** প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত (NHRC 2023)।

একজন মানুষের কাজের বিনিময়ে যথাযথ পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। একজন শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার আছে। শ্রমিকের ব্যাপারে ইসলামী আইনের দিক-নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

ক. শ্রমিকের সাথে সুন্দর আচরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দাম্ভিক আত্মগর্বীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না (al-Qur'ān, 4:36)।

খ. শ্রমিকের জন্য জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায় এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য না করে। তোমরা যদি তাদের শক্তির ঊর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর (al-Bukhārī 2015, 30)।

গ. সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ না দেয়া। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ

অধীনস্তদের জন্যে খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা মালিকের দায়িত্ব। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না (Muslim 2015, 1662)।

ঘ. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক প্রদান করা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে (Ibn Mājah 2015, 2443)

- **ধারা-২৫:** খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এ সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্যকারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহবন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে (NHRC 2023)।

ইসলামের মানবাধিকার নীতির অন্যতম দিক হলো এখানে নারী, শিশু ও দুর্বলরা সর্বদা নিরাপদ। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই তিন শ্রেণির নাগরিকদের সাথে অশোভন আচরণ নিষিদ্ধ। পাশাপাশি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাধারণ নাগরিকদের সাথেও অশোভন আচরণকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কোন নারী কিংবা শিশু যদি যুদ্ধবন্দী হিসেবে বন্দী হয় তথাপিও তাদের সাথে অশালীন আচরণ করা যাবেনা। আল্লাহর বাণী,

﴿ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا﴾

আর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। তারা বলে, 'আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি কেবল

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না, চাই না কোন কৃতজ্ঞতা (al-Qur'ān, 76: 8-9)।

ক্ষুধার্তকে সর্বাবস্থায় খাবার দিতে হবে-এটি একটি মৌলিক নীতি। বস্ত্রহীনকে সর্বাবস্থায় বস্ত্র দিতে হবে। আহত এবং রুগ্ন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকারী। ভূখা-নাঙ্গা, আহত এবং রুগ্ন ব্যক্তি শত্রু হোক বা বন্ধু হোক তাতে কিছু যায় আসে না, তাকে তার অধিকার প্রদান করতে হবে। ইসলামের ভাষ্য হলো, ধনীদের সম্পত্তিতে রয়েছে গরীবদের অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ﴾

আর তাদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে (al-Qur'ān, 51:21)।

- **ধারা-২৬:** প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে। কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা বেছে নেয়ার পূর্বাধিকার পিতামাতার থাকবে (NHRC 2023)।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্য হতে অন্যতম। ইসলামী মানবাধিকার আইনে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার রয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ দল ও মত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم

ইলম বা জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। (Ibn Mājah 2015, 224)

ইসলাম পিতামাতাকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও তারবিয়াত দান করা এবং তাদের পরকালীন জীবনের শ্বাশ্বত সফলতাকে নিশ্চিত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইসলামের মানবাধিকার ও জাতিসংঘের মানবাধিকারের মধ্যকার পার্থক্য

জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকারের সাথে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের মৌলিকভাবে এবং বিষয়গতভাবে তেমন পার্থক্য না থাকলেও ধারণাগতভাবে কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন:

ক. উৎপত্তিগত

পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকারের উৎপত্তি সাধিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ থেকে কিংবা ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা থেকে। পাশ্চাত্য জগতে দু-তিন শতাব্দী আগেও মানবাধিকারের কোন ধারণার ইতিহাস নেই। কিন্তু ইসলামী মানবাধিকারের ধারণার সূচনা হয়েছে অনেক আগে অর্থাৎ ১৪ শত বৎসর পূর্বে। জাতিসংঘ যেখানে মাত্র ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার নীতি ঘোষণা করে সেখানে ৬১০ খ্রি. সালেই মহানবী ﷺ কর্তৃক জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, নির্বিশেষে সবার জন্য সমান প্রযোজ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল।

খ. বাস্তবায়ন

ইসলামে কেবলমাত্র মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য কিছু মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং ঐ সমস্ত অধিকার যদি কেউ লংঘন করে তাহলে তার প্রতিকার দুই ভাবে করার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন:

১. রাষ্ট্রীয় আদালতের মাধ্যমে

২. পরকালীন শাস্তির ঘোষণার মাধ্যমে।

যদি কোন ব্যক্তির অধিকার লংঘিত হয়, তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার অধিকার বলবৎকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।যদি রাষ্ট্রীয় আদালতে কোন প্রতিকার না পাওয়া যায় তবে ইসলামী আইন ও দর্শন অনুসারে অধিকারহরণকারী অবশ্যই পরকালীন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকারের এ ধরনের তেমন কোন ধারণা পরিলক্ষিত হয় না। কেননা তার পেছনে কোন শক্তি বা কর্তৃত্ব নেই যা তাকে কার্যকর করতে পারে।

ইসলামের মানবাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়াহ আইনে ইসলামী মানবাধিকার আইনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. ইসলামী মানবাধিকার আইন আল্লাহ প্রদত্ত। ইসলাম মানুষের যেসব অধিকার ঘোষণা করেছে, তা মৌলিকভাবে আল্লাহর ঘোষণা এবং আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। আর স্রষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য কোন অধিকার প্রয়োজন, তা সর্বাধিক অবগত। তাই ইসলাম ঘোষিত মানবাধিকার মানবপ্রকৃতির অধিক অনুকূল।

খ. ইসলামের মানবাধিকার আইন সর্বজনীন। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্বের মানুষেরা মোটাদাগে দুইভাগে বিভক্ত। মুসলিম ও অমুসলিম। ইসলামের নির্দেশ হলো, বিশ্ব পরিবারের সদস্যদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা। মুসলমানগণ শুধু তাদের থেকেই যেন মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা তাদের ওপর নিপীড়ন চালায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে অন্য পক্ষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করলে যেন তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

যতক্ষণ তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তোমরাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর (al-Qur'ān, 9:7)।

এ ছাড়াও আল কুরআন আমাদেরকে সকল মানুষের প্রতি সৌজন্য ও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قولوا للناس حسنا﴾

মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বল (al-Qur'ān, 2 : 83)।

সুস্পষ্ট এ আয়াতে শুধু মুসলমানদের সঙ্গে নয়,বরং বিশ্ব পরিবারের সকল মানুষের প্রতি এরূপ আচরণ করতে বলা হয়েছে। অন্য যে আয়াতটিতে বিশ্ব পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে তা হলো ,

﴿فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দিও না; আর সংশোধনের পরে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মুমিন হও (al-Qur'ān, 7:85)।

আল কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়সংগতভাবে বিচার করো (al-Qur'ān, 4:58)।

আয়াতগুলো অনুধাবনে এর সর্বজনীনতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। আয়াতগুলো মানব জীবনের সকল দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন, ওজনে ও পরিমাণে কম দেয়া,সামাজিক ও সেবামূলক কাজে অসতর্কতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দান,বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ না করা ইত্যাদি কর্মের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করা হয়েছে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই উপরিউক্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। ইসলাম ঘোষিত মানবাধিকার ব্যাপক ও বিস্তৃত। তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিকতার মধ্যে পার্থক্য করে না। বরং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে।

গ. ইসলামী মানবাধিকার আইন ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম মানুষের অধিকার রক্ষাকে ঈমান ও ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। যেমন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মুখ ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ হবে।

ঘ. ইসলামী মানবাধিকার আইন ভারসাম্যপূর্ণ। এটি ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম অন্য সব ক্ষেত্রের মতো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়ও ভারসাম্য রক্ষা করেছে। যেমন, ইসলাম ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রকে হুমকির মুখে ফেলে, সমাজে পাপাচার বিস্তার লাভ করে, তবে ইসলাম তাকে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয়।

ঙ. ইসলামী মানবাধিকার আইন স্থায়ী ও অপরিবর্তন যোগ্য। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য জীবন বিধান। তাই ইসলাম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে বিধান দিয়েছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয়। ইসলামের মৌলিক বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই (al-Qur'ān, 6 :115)।

চ. ইসলামী মানবাধিকার আইন শর্তযুক্ত। ইসলাম মানুষের সব অধিকার স্বীকার করে। তবে শর্ত হলো, তা আল্লাহর বিধানের বিপরীত হতে পারবে না। মানবাধিকারের নামে আল্লাহর বিধান অমান্য করার সুযোগ ইসলামে নেই।

ছ. ইসলামী মানবাধিকার আইন মানবিক সত্তার সাথে জড়িত। মানবিক সত্তার স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে মানবাধিকার খুবই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম মানবাধিকারকে মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করতে চায়। মানুষের দুর্বলতা, ক্ষমতা, মর্যাদা, মানবিকতাসহ সকল কিছুই ইসলামের মানবাধিকার আইনে বিবেচ্য।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রবন্ধের শেষে সার্বিক পর্যবেক্ষণে যে বিষয়গুলো ফুটে ওঠেছে তা হলো:

১. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বেশীরভাগ ধারাই ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২. ৪ নং ধারাতে যে দাস-দাসীর কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে ইসলামী মূলনীতির সারমর্ম হলো: এটা তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলাম তা সমূলে উৎপাটন যেমন করেনি তেমনিভাবে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোর ব্যাপারেও কোনো উৎসাহ দেয়নি বরং দাস মুক্ত করার বিষয়েই বহু স্থানে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ধারা নং ১৫ এর মধ্যে জাতীয়তা গ্রহণ ও পরিবর্তনের স্বাধীন অধিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, যে কোনো দেশের জাতীয়তা বিভিন্ন ভিত্তির ওপর গড়ে উঠতে পারে, ধর্ম ব্যতীত অন্য যে কোনো ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা জাতীয়তা অবলম্বন ও পরিবর্তনের অধিকার ইসলাম অনুমোদন করে। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তার ভিত্তি ইসলাম হলে তা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে জাতীয়তার ভিত্তি ইসলাম হলে তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলাম রক্ষণশীল এবং তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করেছে।

৪. ধারা নং ১৯ এর মধ্যে মতামত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার ব্যক্ত করা হয়েছে, ইসলামী বিধানানুসারে ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মতামতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিধান রয়েছে। আর যদি মতামতের সম্পর্ক ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে অন্যের অনিষ্ট সাধন কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে না হলে, মানুষের কল্যাণকামিতার মানসে যে কোনো মতামত পোষণ ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির থাকবে। ইসলাম মনে করে সমাজের কল্যাণকামিতার সাথে সংশ্লিষ্ট মতামত প্রকাশ করা শুধু মানুষের অধিকারই নয়; বরং এটি মানুষের বিশেষ করে প্রত্যেক মুসলমানদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

৫. ধারা নং ২১ এ জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এটি ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামী বিশ্বাসানুসারে ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহ তাআলা।

৬. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারাসমূহ বর্তমান যুগের মানবাধিকার সমস্যার সমাধান ও প্রতিকার নির্দেশ করেছে। ইসলাম সর্বযুগের সকল সৃষ্টির সার্বিক অধিকার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

৭. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারাসমূহের দ্বারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আইন, প্রশাসন ও রাষ্ট্রনির্বাহীদের সদিচ্ছার প্রয়োজন। কিন্তু ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করে ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং জাতি, গোত্র, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সাথে মানবিক ও আন্তরিক আচরণ করার জন্য নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা লালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে ইসলামী শিক্ষায় উজ্জীবিত প্রতিটি ব্যক্তি অন্যের অধিকার হরণকে নিজের নৈতিকতার লঙ্ঘন মনে করে। তাছাড়া ইসলাম ইহকালিন ভালো-মন্দ কাজের জন্য পরকালিন মুক্তি ও শাস্তি লাভের দীক্ষা প্রদান করে। সুতরাং শুধুমাত্র পার্থিব আইন ও শাস্তির ভয়েই নয় বরং পরকালিন মুক্তি ও শান্তি লাভের প্রত্যাশায় ইসলাম সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করে।

সুপারিশমালা

১. 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন'কে যথাযথ, কার্যকর ও গণবান্ধব করে এর সেবা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া।

২. 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' এ ইসলামিক স্কলারদেরকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে ধর্মের আলোকে মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ব্যাপকভাবে মানবাধিকার বিষয়ক পাঠঅন্তর্ভুক্ত করা

৪. যেহেতু সকল ধর্মের মূলকথা মানবকল্যাণ ও মানবতার সুখ-শান্তি নিশ্চত করা সেহেতু ধর্মগুলোর আলোকে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাকে পর্যালোচনা করে সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা।

৫. বিভিন্ন ধর্মের স্কলারদের সমন্বয়ে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা' বিষয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা এবং তাদের মাধ্যমে সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

উপসংহার

ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অতি আবশ্যিক কিছু সুযোগ-সুবিধা জন্মসূত্রে প্রাকৃতিকভাবে মানুষ অর্জন করে থাকে। মানবাধিকার হলো সেই সকল সর্বজনীন মানবিক অধিকার. যেগুলো সীমিত ও সংকীর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকারের থেকে অনেক বেশি এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আরো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, নির্বিশেষে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলো তার সত্তার সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও চর্চিত একটি বিষয়। ইসলামে

গোড়াপত্তনের সাথে সাথেই মানবাধিকার নিশ্চিত হয়েছিল। প্রতিটি মানুষই ইসলামের আইন অনুযায়ী তাঁর স্ব স্ব অধিকার ভোগ করতেন। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকারের মূলনীতি ঘোষণা করলেও তা প্রতিষ্ঠায় বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়, জাতিসংঘের ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রটি কেবলমাত্র পশ্চিমা সদস্য দেশগুলোর বেলায় প্রযোজ্য। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মানুষের কিছু মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার অধিকাংশ ধারা ইসলামের বিভিন্ন বিধানের সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং ইসলাম মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, জীবন ও সম্পদ, সম্মান ও সম্ভ্রম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় যদি সমাজে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে জাতি, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সুখে-শান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *al- Ṣaḥīḥ.* Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah

al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Ibn Anas, Mālik. 2003. *Al Muwaṭṭa.* Dubai:Mazmū'a Al Furqān Al Tizāriyya

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd. 2015. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah

Joarder. Md Mahbub-Ul-Haque. 1988. *Antorjatik Ainer Dristite Manobadhikar*. Dhaka: Bangla Academy.

Salauddin. 2004. *Moulik Manobadhikar*. Translated by Muhammad Abul Bashar Akhonda. Dhaka: Islamic Foundation.

Sayed, Farhana. 2016. *Manobadhikar ki*. Dhaka: Jatio Manobadhikar Comission

Imam Batayan. 2019. "Manobadhikar O Islam". https://imam.gov.bd/singlepost/5419

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī. 2015. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

NHRC. 2023. *Manobadhikarer Sarbojonīn Ghoṣoṇapotro, 1948*. Last Modified: February 09, 2020. http://www.nhrc.org.bd/site/page/5892901e-edbf-4e2c-9cdc-5f8d7a3682ef/-